"হরিণ ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি,
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায় ;
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায় !
তাদের করিয়া ত্যাগ রহিব কোথায় ?

* * * *

আয় পাখী ! আয় আয় ! কার তরে রবি হায়
উড়ে যা উড়ে যা পাখি ! তরুর শাখায় !
প্রভাতে কাহারে পাখি ! জাগাবি রে ডাকি ডাকি
কমলা ! কমলা ! বলি মধুর ভাষায় ?

* * * *

চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে,
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার।"[১]

শকুন্তলা চলিয়া যাইবার সময়ে মৃগেরা পশ্চাৎ হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়াছে, তরুলতাও বিষণ্ন হইয়া পড়িয়াছে—

"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ
ময়ুর নাচে না যে আর
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হ'তে
যেন সে আঁখিজল ধার[২]।"

কমলা চলিয়া যাইবার সময়ে তাহার আসন্ন বিয়োগে সমস্ত বনভূমিও বিরহ-কাতর—

"সমীরণ ধীরে ধীরে, চুম্বিয়া তটিনীনীরে
দুলাইতেছিল, আহা, লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায় ?
সহসা রে জলধর নব অরুণের কর
কেন রে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে ?
পাপিয়া শাখার পরে, ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি করনা গান, থামিলি কেন রে ?"

১। বনফুল ২য় সর্গ, ১৯-২০ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১৮৮২, মাঘ, ১৩৮ পৃঃ।

২। শকুন্তলা প্রাচীন সাহিত্য, ৩৬ পৃঃ। বঙ্গদর্শন, ১৩০৯. আশ্বিন, ২৮২ পৃঃ।

কুটীর ডাকিছে যেন যেওনা যেওনা !—
তটিনী তরঙ্গকুল ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেওনা ! যেওনা !'—
বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙুল তুলি
যেন বলিছেন আহা "যেওনা! যেওনা।"[১]

তৃতীয় সর্গ

লোকালয়ে আসিবার পর বিজয়ের এক সখী নীরজা কমলাকে নানাপ্রকারে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। যমুনার তীরে বাগানে দুই সখী বেড়াইতেছে, নীরজার সহিত কমলার বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কমলার হৃদয় ভারাক্রান্ত। নীরজা কমলাকে বলিল—

"আয় আয় সখি ! আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা
হেথায় আয় লো বিপিনবালা !

* * * *

আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে,
কুড়ানা হোথায় বকুলগুলি,
মাধবীর ভারে লতা নুয়ে পড়ে,
আমি ধীরি ধীরি আনি লো তুলি।
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে !
দেখ্‌সে হেথায় কামিনী-পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
পারি না লো আর, আয় হেথা বসি
ফুলগুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি।

১। বনফুল, ২য় সর্গ, ২১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২, মাঘ, ১৩৮ পৃঃ।

হেথায় পবন, খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি।
আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
শুই একটুকু ঘাসের পরে,
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুর্
আঁখি মুদে আসে ঘুমের তরে!
বল্ বন-বালা এত কি লো জ্বালা?
রাত দিন তুই কাঁদিস বসে!
আজো ঘুমঘোর ভাঙ্গিল না তোর
আজো মজিলি না সুখের রসে।"[১]

কিন্তু কমলা কিছুতেই তাহার সেই বন, সেই পাহাড়, সেই গিরি নদী, সেই পাখী ও হরিণের কথা ভুলিতে পারিতেছে না—

"ভুলিব সে বন? ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগে যাব ভুলে কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিঙ্গ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে।"[২]

কমলার মনে পড়ে—

"সরসী ভিতরে ফুটিলে কমল
তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে।
দেখি মুখ তুলে কমলিনী দুলে
এ-পাশে ও-পাশে পড়িত ঢলে!
গাছের উপরে ধীরে ধীরে ধীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে দিতাম লতা।

১। বনফুল, ৩য় সর্গ, ২২-২৪। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।
২। বনফুল, ২য় সর্গ, ২৫ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

বসি একাকিনী আপনা-আপনি
কহিতাম ধীরে কত কি কথা।"[১]

প্রকৃতির কোলে শৈশবের খেলার কথা মনে পড়ে—

"তুষার কুড়ায়ে আঁচল ভরিয়ে
ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে।
পড়িলে কিরণ কত যে বরণ
ধরিত; আমোদে যেতাম গলে!
দেখিতাম রবি বিকালে যখন
শিখরের শিরে পড়িত ঢোলে;
করি ছুটাছুটি শিখরেতে উঠি
দেখিতাম দূরে গিয়েছে চলে'!
আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
দেখিতাম আরো গিয়াছে সরে!"[২]

সরসীর জলে খেলা করিতে করিতে—

"তট দেশে পুনঃ ফিরি আসি পর
অভিমান ভরে ঈষৎ রাগি,
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম, জল উঠিত জাগি।"[৩]

শকুন্তলা ও কমলা দুজনেই প্রকৃতির শিশু, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত উভয়ের সম্বন্ধ অতি নিবিড়, কিন্তু এক বিষয়ে শকুন্তলা ও কমলার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। শকুন্তলা চিরদিন মানুষের সঙ্গ পাইয়াছে, মানব সমাজের প্রতি তাহার কোন বিতৃষ্ণা নাই। কমলা মিরান্দার ন্যায় লোকালয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সে মানুষের সঙ্গ কখনও পায় নাই, তাই মানবসমাজের প্রতি কমলার কোন টান নাই।

"চাহি না জ্ঞেয়ান, চাহি না জানিতে
সংসার মানুষ কাহারে বলে।

১। বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।
২। বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৭ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।
৩। বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৭ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২২৯ পৃঃ।

বনের কুসুম ফুটিতাম বনে,
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে।"

কিন্তু তাহা হইবার নহে, কমলাকেও মানুষের সংসারে আসিয়া পড়িতে হইল। মিরান্দাকে সংসারের আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই, কিন্তু মিরান্দারই ন্যায় অসহায় বনফুল কমলাকে সংসারের আঘাত সহ্য করিতে হইল।

বিজয় কমলাকে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু কমলা সংসারের কিছুই জানে না, বিবাহ কাহাকে বলে বোঝে না, সে বিজয়ের বন্ধু নীরদকেই ভালবাসিল। মানুষের সংস্পর্শে হৃদয়বৃত্তির উত্তাপে বনের স্বাভাবিক সরলতা ঘুচিয়া গিয়াছে, কমলা এখন লোকালয়ে আসিয়া পড়িয়াছে—

"জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি রে হায় ভালবাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে।"[২]

কমলা ও নীরজা বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দূরে নীরদ গান ধরিল। বালক-কবি এই বয়সেই গীতিকবিতায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত নীরদের গানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বালক-কবি বড় বড় ছন্দ কিরূপ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখিলেও আশ্চর্য হইতে হয়—

"কি জানি লো বালা। কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে!
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয়পুটে!
অস্ফুট মধুর স্বপন যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি!
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ

১। বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩০ পৃঃ।
২। বনফুল, ৩য় সর্গ, ২৯ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩০ পৃঃ।

জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি !
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে
ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি ।[১]

কমলা মনের কথা লুকাইতে জানে না. নীরদকে যে সে ভালবাসে নীরজার নিকট সহজেই তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল—

"আপনার ভাবে আপনি কবি
রাত-দিন আহা রয়েছে ভোর !
সরল প্রকৃতি মোহন-ছবি
অবারিত সদা মনের দোর !

* * *

কারে ভালবাসে ? কাঁদে কার তরে ?
কার তরে গায় খেদের গান ?
কার ভালবাসা পায় নাই ফিরে
সঁপিয়া তাহারে হৃদয়-প্রাণ ?

* * *

বসেছিনু কাল ওই গাছ-তলে
কাঁদিতেছিলেম কত কি ভাবি—
যুবক তখনি সুধীরে আপনি
প্রাসাদ হইতে আইল নাবি ।

* * *

চাহিতে নারিনু মুখপানে তাঁর
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
সরমে পাশরি বলি বলি করি
তবুও বাহির হ'ল না কথা !

১। বনফুল. ৩য় সর্গ ৩৫ পৃঃ ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র. ২৩২ পৃঃ ।

কাল হতে ভাই! ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হয়েছে কেমন ধারা!
থাকি, থাকি, থাকি, উঠি লো চমকি,
মনে হয় কার পাইনু সাড়া।[১]

চতুর্থ সর্গ

একদিন নিভৃত যমুনা-তীরে নীরদ-কমলার দেখা হইল। বালক-কবি দুই লাইনে সেই ছবি আঁকিয়াছেন—

"যেন দোঁহে জ্ঞান হত—নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে।"[২]

কমলা মুখ ফিরাইয়া লইল—

মুখ ফিরাইল বালা, দেখিল জ্যোছনা-মালা
খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোল স্বর উঠিছে আকাশ পর
অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী গভীরে!
দেখে শূন্যে নেত্র তুলি—খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি
জ্যোছনা মাখিয়া গায় উড়ে উড়ে যায়।
দেখিছে লুটায় ঢেউ, আবার লুটায়
দিগন্তে খেলায় পুনঃ দিগন্তে মিলায়।
এক খণ্ড উড়ে যায়, আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি—মলিন করিয়া রাতি
মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।
পাখী এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
ফেনখণ্ড গেল ভেসে নীল নদীজলে,
দিবা ভাবি, অতি দূরে, আকাশ সুধায় পুরে
ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপীয়া।

১। বনফুল, ৩য় সর্গ, ৩৩, ৪০-৪২ পৃঃ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২, চৈত্র, ২৩১-২৩৪ পৃঃ।
২। বনফুল, ৪র্থ সর্গ ৪২ পৃঃ; জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১০ পৃঃ।

পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে, উচ্চ হতে উচ্চে উঠে,
আকাশ সে সূক্ষ্মস্বরে উঠিল কাঁপিয়া।

* * *

দেখি দেখি থাকি থাকি আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র—অবশ পলকপত্র
অপূর্বমধুর ভাবে বালিকা বিবশা।"[১]

কমলা মানুষের সংসার চিনিত না, শকুন্তলারই ন্যায় "তাহার হৃদয় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার—গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই।" সে সহজেই নীরদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

নীরদও কমলাকে ভালবাসে কিন্তু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না বলিয়া কমলাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, বলিল যে—বিজয় তাহার স্বামী, এখন অপর কাহারও কথা মনে করা পাপে। কিন্তু কমলা এসব কথা কিছুই বুঝিতে পারে না—

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না ত আমি—
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী;
এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি—
দেখিবারে আঁখি মোর ভালবাসে যারে,
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধাবাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে।"[২]

লোকনিন্দা কলঙ্ক সে কিছুই বোঝে না—

"ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বল গো নীরদ আমি কি করিব তায়?
রটায়ে কলঙ্ক তবে হাসুক না তারা।"[৩]

১। বনফুল, ৪র্থ সর্গ ৪৩-৪৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৬ পৃঃ।
২। বনফুল, ৪র্থ সর্গ ৪৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ, ৩১৭ পৃঃ।
৩। বনফুল, ৪র্থ সর্গ ৪৭ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ, ৩১৭ পৃঃ।

নীরদ যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে, কমলার সেই এক কথা "আমি তা জানি না।" নীরদ তখন কমলাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল যে তাহাকে সে কোনমতেই প্রশ্রয় দিবে না এবং কমলার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবে না। চোদ্দ বছর বয়সেও বালক কবির মানব-হৃদয়-জ্ঞানের অভাব ঘটে নাই—

"ভর্ৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত!
কমলা নয়নজল ভরিয়া নয়নে,
মুখপানে চাহি রয় পাগলের মত।"[১]

নীরদ অশ্রুসংবরণ করিয়া সবেগে সেখান হইতে প্রস্থান করিল, কমলা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে অনাবশ্যকরূপে জটিল করিয়া তুলিয়া মানুষ যে কত দুঃখ পায় বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়াছিলেন। বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্যেও যে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে তাহা এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়িয়াছিল। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের মধ্যে যেখানে একমাত্র প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কত অশান্তির সৃষ্টি কত দুঃখ কত গ্লানি এবং সেখানে পরিণামে যে কি ভীষণ সর্বনাশ তাহা রবীন্দ্রনাথ পরেও অনেকবার দেখাইয়াছেন।

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চম সর্গে সংসারের জটিলতা আরও ঘনাইয়া উঠিল। বনভূমির সরল স্বাভাবিকতা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—মানুষের সংসার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, এখানে মানুষে মানুষে কত ভুল বোঝা কত বিরোধ কত বিক্ষোভ। কেবল নীরদ-কমলাকে লইয়া নহে, চারিদিকে আরও কত অশান্তি কত জটিলতার সৃষ্টি হইল। সমস্ত ঘটনার মধ্যে কাননের সহিত লোকালয়ের পার্থক্য ফুটিয়া উঠিল।

/ নীরজা বিজয়কে ভালবাসে কিন্তু বিজয় তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহার সুখ দুঃখ আশা নিরাশার কথা সে নীরজাকে ডাকিয়াই বলে। নীরজা

১। বনফুল, ৪র্থ সর্গ, ৩৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ ৩১৭ পৃঃ।

বুঝিল যে বিজয়ের ভালবাসা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল, কমলার প্রতি তাহার মন বিমুখ হইল।

বিজয়ের নিকট নীরজা সখীমাত্র, বিজয়ের নিকট নীরজার নারীমর্য্যাদা কিছুই নাই. সে অসঙ্কোচে নীরজার নিকট তাহার প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করিয়াছে। কাদম্বরীকাহিনীতে পত্রলেখার সহিত যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের যে সম্বন্ধ, নীরজার সহিত বিজয়েরও সেই এক সম্বন্ধ। কাদম্বরী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে পত্রলেখা অনাদৃতা, কাব্যে উপেক্ষিতা, পত্রলেখার প্রণয়তৃষ্ণার্ত চিরবঞ্চিত নারী-হৃদয়ের কথা বাণভট্ট বিস্মৃত হইয়াছিলেন।[১]

বালক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নীরজার কথা ভুলেন নাই, পঞ্চম সর্গে নীরজার কোমল নারীহৃদয়ের ব্যথিত শোক বেদনায় সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে. নীরজা পাশ হইতে তাহাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

বিজয় ঘুমাইতেছে. এ স্থলে আকাশের একটি অদ্ভুত বর্ণনা আছে :—

"বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়,
নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে।
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি!
ভয়ে ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র প্রাণ মন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন
অবশ্য ভুয়ার ধরিত চাপি।"[২]

Weird চিত্র বর্ণনায় বালক-কবির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে ক্ষুধিত-পাষাণের ছবি যিনি আঁকিয়াছেন, বাল্যকালে তাঁহার দ্বারাই ক্ষুধিত আকাশের ছবি আঁকা সম্ভবপর হইয়াছিল।

১। ভারতী, ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ ১১১ পৃ:।
২। বনফুল, ৫ম সর্গ, ৫১ পৃ:। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ, ৩১৮ পৃ:।

ষষ্ঠ সর্গ

এদিকে কমলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে যে তাহার সেই কাননের জীবন এবার ভুলিতে হইবে, মানুষের সংসারে ভাল করিয়া নিজেকে মিলাইয়া দিতে হইবে; এমন সময়ে সে নীরজাকে দেখিতে পাইল. নীরজাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—

"ওই যে নীরজা আসে পরাণ-স্বজনী,
একমাত্র বন্ধু মোর পৃথিবী মাঝার!
হেন বন্ধু আছে কি রে, নির্দয় ধরণী!
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?"[১]

কিন্তু নীরজা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, কমলা ডাকিয়া বলিল—

"ওকি সখি কোথা যাও? তুলিবে না ফুল?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবে না মালা?

* * *

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখিজল,
কোথা যাও, কোথা সই, যেও না যেও না!
কি হয়েছে? বল্‌বিনে—বল্ সখী বল্।
কি হয়েছে কে দিয়েছে কিসের যাতনা?"[২]

নীরজা চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে বলিয়া গেল—'জ্বালালি! জ্বলিলি!" নীরজার এই প্রত্যাখান কমলার পক্ষে বড় ক্রূর বড় করুণ, অথচ ইহার জন্য নীরজাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না, সংসারে প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটিতেছে এবং তাহার জন্য দায়ী কেবল মানুষের স্বভাব।

কমলা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"জ্বালালি! জ্বলিলি!"—

"কমলা চাহিয়া রয় নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ়দেশে অশ্রুরাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস,
কমলা কহিল ধরে—জ্বালালি জ্বলিলি!"[৩]

১। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।
২। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫৫ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।
৩। বনফুল ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ ৪২১ পৃঃ।

কিন্তু বড় দুঃখের সময়েও কমলার দৃষ্টি আবার প্রকৃতির দিকেই ফিরিল, একমাত্র প্রকৃতির কোলেই বনফুলের সান্ত্বনা—

"আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে,
যমুনা-তরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর,
তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজন্ময় কর!
হেরিল আকাশ পানে, সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে।
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কি মনে লাগিল ভাবিতে!"[১]

নীরদের কথা মনে পড়িল, কমলা কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে নীরদকে ভালবাসায় দোষ কোথায়। সে বিজয়কে বলিয়াছে—

"বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল,
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান।"[২]

কমলা বুঝিতে পারে না যে বিজয়কে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সে কেন নীরদকে ভালবাসিতে পারে না—"এ ত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?"—কমলা বসিয়া বসিয়া নীরদের কথা ভাবিত লাগিল।

কমলার সরলতা এরূপ স্বাভাবিক যে সংসারের মাপকাঠিতে যাহা কলঙ্ক তাহা কমলাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

"ঘরের ভিতর যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায়, তাহার ধূলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না; কিন্তু বন্য ফুলের ধূলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না—সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধূলাও লাগে, শুধু সে কেমন সহজে আপনার নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধূলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই—সে সরলা অরণ্যের মৃগীর মত, নির্ঝরের জলধারার মত মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।"[৩]

১। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ ৫৩ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।
২। বনফুল ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২১ পৃঃ।
৩। "শকুন্তলা" প্রাচীন সাহিত্য, ৩০ পৃঃ। বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আশ্বিন, ২৭৮ পৃঃ।

কমলাও অতি সহজে আপনার স্বচ্ছ নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়াছে—কোন মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কমলা দেখিতে পাইল নীরদ চলিয়া যাইতেছে—

"মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা
হৃদয়ে শোণিতরাশি উঠে উথলিয়া।"[১]

কিন্তু—

"যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
যুবক চলিয়া যায়, বালিকা তবুও হায়!
চাহি রহে একদৃষ্টে আঁখি দুই মেলি।"
"ঘুম হতে যেন জাগি. সহসা কিসের লাগি
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়

* * *

কোথা যাও—কোথা যাও—নীরদ! যেও না!
একটি কহিব কথা শুন একবার।
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত রও—পুরাও কামনা!
কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার!"

কমলা নীরদের নিকট আপনার হৃদয়ের কথা জানাইল। নীরদ বলিল, যে-বিজয়ের জন্য সে এতদিন সমস্ত সহ্য করিয়া আছে এখন সেই বিজয় তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছে, নীরদ চিরদিনের জন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে; কমলার নিকট সে বিদায় চাহিল।

নীরদের প্রতি বিজয়ের ব্যবহারের কথা শুনিয়া কমলা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—

"কমলা তোমারে আহা ভালবাসে বোলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়!
প্রেমেরে ডুবাব আজ বিস্মৃতির জলে
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন?

১। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৩ পৃঃ।

নিষ্ঠুর! আমারে আর পাবি কি কখন?
পদতলে পড়ি মোর, দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?"[১]

চোদ্দ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে এরূপ স্থলে জোর করিয়া কোন লাভ নাই। "ঘরে বাইরে"তে নিখিলেশ সন্দীপকে কেন তাড়াইয়া দিল না বলিয়া যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত। বিজয়ের ব্যবহারে কমলার মন সম্পূর্ণ বিমুখ হইল, সে নীরদকে স্পষ্ট বলিল—

"নীরদ। তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন!'[২]

এমন সময়ে বিজয়ের ছুরিকায় অতর্কিতভাবে আহত হইয়া নীরদ অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

"যুবকের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি রহিল তথায়,
একবিন্দু পড়িল না নয়নের জল
একেবারো বহিল না দীর্ঘশ্বাস-বায়।"[৩]

নীরদ একবার মাত্র চেতনা পাইয়া বন্ধুর কথা স্মরণ করিল. বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতা শাণিত ছুরি অপেক্ষাও তাহাকে বেশী আঘাত করিয়াছে, তথাপি তাহার বিশ্বাস অটুট যে—"একদিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয়, একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকারে।" কমলার নিকট বিদায় লইয়া নীরদ মরিল।

হাতে যতক্ষণ কাজ ছিল কমলার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই, সে স্থিরচিত্তে নীরদের শুশ্রূষা করিয়াছে; কিন্তু কাজ যখন ফুরাইল তখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া উঠিল—

"জলন্ত জগৎ! ওগো চন্দ্র সূর্য্য তারা!
দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে!
পৃথিবীর পাপ-পূণ্য, হিংসা, রক্তধারা
তোমরাই লিখে রাখ জলদ্ অক্ষরে!

১। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৩-৬৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর. ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৪ পৃঃ।

২। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৪ পৃঃ।

৩। বনফুল. ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ. ৪২৪ পৃঃ।

সাক্ষী হও তোমরা গো, করিও বিচার !—
তোমরা হও গো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর !
ব'হে যাও !—ব'হে যাও যমুনার ধার,
নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর !
এখনই অস্তাচলে যেও না তপন !
ফিরে এসো—ফিরে এসো তুমি দিবাকর,
এই—এই রক্তধারা করিয়া শোষণ—
লয়ে যাও—লয়ে যাও স্বর্গের গোচর !

* * * *

অবাক হউক পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে !
অবাক হইয়া যাক আঁধার নরক !
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে !
প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়ন-পলক !"[১]

বিজয়কে নীরদ ক্ষমা করিয়াছিল, কিন্তু কমলা ক্ষমা করিতে পারিল না—

"রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন !
বিস্মৃতি ! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে ;
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে !
বিষাদ ! বিলাসে তার মাখি হলাহল
ধরিও সম্মুখে তার নরকের বিষ !"[২]

এইখানেই কমলার পরাজয়, তপোবনের গাম্ভীর্য্য তাহার চরিত্রকে স্পর্শ করে নাই, শকুন্তলার স্তব্ধতা তাহার নাই। "মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসার-জ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই ;—আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন।" কমলাকেও শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিলাম, কিন্তু সংসারের অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। মানুষের সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ দূরে বিজন কাননের মধ্যে কমলা তাহার চরিত্রে এমন কিছু সঞ্চয়

১। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৭-৬৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৫ পৃঃ।

২। বনফুল, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৯ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ শ্রাবণ, ৪২৫ পৃঃ।

করিবার সুযোগ পায় নাই যাহা তাহাকে তপোবন-দুহিতা শকুন্তলার ন্যায় ধৈর্য্যে ক্ষমায় কল্যাণে স্থির রাখিতে পারে।

সপ্তম সর্গ

শ্মশান

সপ্তম সর্গে শ্মশানের ভয়ঙ্কর দৃশ্য বর্ণনা, বালক কবির অসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন—

"গভীর আঁধার রাত্রি, শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন আসিয়াছে আপনার আঁধার আসন!
সরসর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে বায়,
প্রান আকুলিয়া বহে ধুমময় শ্মশানের বায়!
গাছপালা নাই কোথা প্রান্তর গভীর!
শাখাপত্রহীন বৃক্ষ শুষ্ক দগ্ধ উঁচু করি শির
দাঁড়াইয়া দূরে·······

* * * *

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক
হেথা হোথা অস্থিরাশি ভস্ম মাঝে লুকাইয়া মুখ!
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে নিভাইয়া অঙ্গার-শিখায়।
বিকট দর্শন মেলি মানব-কপাল
ধ্বংসের স্মরণস্তূপ, ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল!
গভীর আঁখি-কোটর, আঁধারেরে দিয়েছে আবাস,
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস!"[১]

নীরদের চিতা জ্বলিতেছে—

"ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধুমরাশি শ্বসে!

১। বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭০-৭১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৫৮ পৃঃ।

একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা নিক্ষেপিয়া আকাশের পরে !"[১]

"তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
নিশীথ-শ্মশান বায়ু স্বনিছে উচ্ছ্বাসে !
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া !
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে !
শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া !—
নীরব শ্মশানময় তুলি প্রতিধ্বনি !
মাথার উপর দিয়া পাখী ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি !"[২]

চিতার পাশে কমলা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে—

"এ হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা !
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ !
শূন্য নেত্রে, শূন্য হৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ন নিবেশ।"[৩]

কিন্তু কমলার মন ফিরিয়া যাইতেছে সেই বিজন কাননে—

"সুধাময়ী বীণাখানি লোয়ে কোল পরে—
সমুচ্চ হিমাদ্রি শিরে বসি শিলাসনে—
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে !
হরিণেরা বন হোতে শুনিয়া সে স্বর—
শিখরে আসিত ছুটি তৃণাহার ভুলি।
শুনিত ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর—
বড় বড় আঁখি দুটি মুখ পানে তুলি !"[৩]

১। বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭২-৭৩ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৫৯ পৃঃ।
২। বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩,ভাদ্র, ৪৫৯-৪৬০ পৃঃ।
৩। বনফুল, ৭ম সর্গ ৭৫ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৬০ পৃঃ।

কমলার ইচ্ছা করিতেছে সেই বিজন কাননে ফিরিয়া যায়—

"আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল।
তটিনী বহিছে যেথা কল কল স্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বনফুলদল।"[১]

চিতা যতক্ষণ জ্বলিতেছিল, কমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু চিতা যখন নিভিয়া আসিল, তখন, সেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ক্রমে চিতা সম্পূর্ণ নিভিয়া গেল, রাত্রি ভোর হইয়া আসিল—

"ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্বাশার স্বর্ণ তোরণে,
রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতি ভালে দিল পরাইয়া।"[২]

সকালবেলা কমলা শ্মশান হইতে উঠিয়া মানুষের লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম সর্গ

বিসর্জন

কমলা তাহার সেই পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির কিছুই পরিবর্তন হয় নাই—

"আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর।
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।

*　　*　　*

কুটীর তটীনীতীরে, লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিল-দর্পণে!

১। বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৬-৭৭ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৬০-৪৬১ পৃঃ।

২। বনফুল, ৭ম সর্গ, ৭৮ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ ভাদ্র, ৪৬১ পৃঃ।

হরিণেরা তরু-ছায়ে খেলিতেছে গায়ে গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপ-কম্পনে।"[১]

কমলা লোকালয়ে যে দারুণ আঘাত পাইয়াছে তাহা ভুলিবার স্থান আর কোথায় সে পাইবে?—

মুছিতে লো অশ্রুবারি এসেছি হেথায়।
তাই বলি পাপীয়ারে! গান কর সুধাধারে
নিবাইয়া হৃদয়ের অনলশিখায়।
তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে!
কিন্তু সেই ছেলেবেলা যেমন করিতে খেলা
তেমনি করিয়া খেলো নির্ঝরের সনে।

* * *

তেমনি খেলিয়ে চল্, তুই লো তটিনীজল!
তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার।
নির্ঝর তেমনি কোরে ঝাঁপিয়া সরসী পরে
পড়্ লো উগরি শুভ্র ফেনরাশিভার!"[২]

কিন্তু মনের ভিতর সমস্তই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে—

"নির্ঝরের ঝরঝরে হৃদয় তেমন কোরে
উল্লাসে হৃদয় আর উঠে না নাচিয়া!
কি জানি কি করিতেছি, কি জানি কি ভাবিতেছি,
কি জানি কেমনধারা শূন্যপ্রায় হিয়া!

* * *

জুড়ায়ে হৃদয়ব্যথা তুলিবে না পুষ্পলতা
তেমন জীবন্তভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণহীন যেন সবি—যেন রে নীরব ছবি
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়।

১। বনফুল, ৮ম সর্গ, ৭৯-৮০ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩, কার্তিক, ৫৬৭ পৃঃ।
২। বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮১ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্তিক, ৫৬৭ পৃঃ।

দেখিয়া লতার কোলে, ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—
হৃদয় নাচে না ত গো তেমন উল্লাসে।
তেমন জীবন্ত ভাব নাই ত অন্তরে।"[১]

পাখীদের কথা মনে পড়িল—"ছায়াকুঞ্জে শুনি গিয়া শুকদের গান"; কিন্তু পাখীর গানও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—

"শুক আর গাবে না কো খুলিয়া পরাণ!
সেও যে গো ধরিয়াছে বিষাদের তান।"[২]

কিন্তু—

"তবুও যাহাতে হোক্ নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল!
তবুও ত আপনারে ভুলিতে হইবে হা রে!
তবুও নিভাতে হবে হৃদয়-অনল!"[৩]

হরিণের কথা মনে পড়িল—

"মালা গাঁথি ফুলে ফুলে, জড়াইব এলো চুলে,
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গল!
বড় বড় দুটি আঁখি, মোর মুখ পানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল!"[৪]

কমলা হরিণের সন্ধানে কাননে প্রবেশ করিল, কিন্তু হায় তাহারা কমলাকে ভুলিয়া গিয়াছে—

"হরিণ নিঃশঙ্ক মনে শুয়ে ছিল ছায়া-বনে
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি নয়নদ্বয় মুখপানে চাহি রয়
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।

১। বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৩-৮৪ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮ পৃঃ।
২। বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮২ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক ৫৬৮ পৃঃ।
৩। বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৩ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮ পৃঃ।
৪। বনফুল- ৮ম সর্গ, ৮২ পৃঃ জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক. ৫৬৮।

ছুটিছে হরিণচয়. কমলা অবাক্ হয়,
নেত্র হতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রুজল.—
ওই যায়—ওই যায়—হরিণ হরিণী হায়—
যায় যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।"[১]

কমলা তাঁহাদের ফিরাইবার জন্য কত ডাকিল—

যাস্‌নে- যাস্‌নে তোরা, আয় ফিরে আয়,
কমলা—কমলা সেই ডাকিতেছে তোরে!
সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে,
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে!
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে!
কোথা যাস্—কোথা যাস্—আয় ফিরে আয়!
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা!
কারে ভয় করি তোরা যাস্ রে কোথায়?
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ! আয় লো চপলা!"[১]

কিন্তু তাহারা কমলাকে ভুলিয়া গিয়াছে—

"এলিনে—এলিনে—তোরা এখনো এলিনে—
কমলা ডাকিছে যে রে তবুও এলিনে!
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে?
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে?"[১]

লোকালয়ের চিহ্ন সে সম্পূর্ণ ঘুচাইয়া দিয়া আবার ডাকিল—

"খুলিয়া ফেলিনু এই কবরী বন্ধন,
এখনও ফিরিলি না হরিণের দল।
এই দেখ্—এই দেখ্—ফেলিয়া বসন
পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল।"[২]

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বিজন কাননে কমলার আর প্রবেশাধিকার নাই। শকুন্তলা সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

১। বনফুল. ৮ম সর্গ, ৮২-৮৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৮-৫৬৮ পৃঃ।
২। ৮ম সর্গ, ৮৫-৮৬ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮৩ কার্ত্তিক, ৫৬৯ পৃঃ।

"তাহার পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্য-বিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্ত ভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত।"[১]

কমলার পক্ষেও তাহাই ঘটিল, সে কাননে ফিরিয়া আসিল বটে কিন্তু আশ্রয় পাইল না। কমলা তাহার শিশুকালে যে স্বর্গে ছিল, তাহা সুন্দর তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণের পর সেখানে আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। লোকালয়ের জন্য কমলা বনভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সংসারের জটিলতা প্রবৃত্তির উন্মত্ততা হিংসার দাবদাহে বিক্ষুব্ধ গোপন বন্ধুহত্যা কমলাকে ত্রাসে বিস্ময়ে বেদনায় বিহ্বল করিয়া দিল, সে ব্যথিত হৃদয়ে তাহার শৈশব-স্বর্গে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সংসারের কঠিন স্পর্শে তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত কমলার সেই স্নেহের সম্বন্ধ সেই মাধুর্য্যের যোগ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বিজন কানন আজ আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না। বনভূমির এই কঠিন নিদারুণ প্রত্যাখ্যান বেদনা-কাতর কমলার পক্ষে কি মর্মান্তিক সকরুণ! বনফুলের ট্রাজেডি এইখানেই চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে—নীরদের মৃত্যু একটি দুঃখাবহ ঘটনামাত্র, মৃত্যু শোক সকলকেই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু কমলার ন্যায় এইরূপ দুঃসহ দুঃখ বেদনা ত সকলকে বহন করিতে হয় না।

য়ুরোপীয় কাব্যরীতি অনুসারে বনফুলের করুণ গীতি দুই স্থলে থামিতে পারিত। সপ্তম সর্গে যদি গল্প শেষ করা হইত তবে জ্বলন্ত চিতার পাশে মূর্চ্ছিত কমলার চিত্র পাঠকের মনকে অসমাপ্ত বেদনায় চিরদিন ব্যথিত করিয়া রাখিত। বাহিরের দিকে সেইখানেই ট্রাজেডি অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি নীরদের মৃত্যু কমলার পক্ষে চরম দুঃখ নহে, তাহা অপেক্ষা কঠিন আঘাত কমলাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, ভিতরের দিক দিয়া করুণ-গীতি এখানেও সমাপ্ত হইতে পারিত। ইহার পরে কমলা যে মরিল, ট্রাজেডির পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক নহে।

কিন্তু ভারতবর্ষের কবি সেখানেও কাব্য শেষ করিলেন না। মৃত্যুর মধ্যে

১। "শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য, ৪২-৪৩ পৃঃ। বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আশ্বিন, ২৮৫ পৃঃ।

কমলা যে পরম শান্তি লাভ করিল কবি তাহা দেখাইলেন। কাব্যের শেষভাগে হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস সংযত হইয়া আসিয়াছে, বর্ণনার অত্যুজ্জ্বলতা শেষ হইয়া গিয়াছে—কমলার মৃত্যুদৃশ্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ।

কমলা হিমালয়ের শিখর আরোহণ করিতেছে—

"এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর!
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারিদিক গেছে খুলে
উপত্যকা বনভূমি বিপিন ভূধর!
তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্রপথে দিল দেখা—
বৃক্ষছায়া দুলাইয়া ব'হে ব'হে যায়!
ছোট ছোট গাছপালা
সঙ্কীর্ণ নির্ঝরমালা
সবি যেন দেখা যায় রেখা-রেখা প্রায়।
গেছে খুলে দিগ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক--
কোথা কুঞ্জ—কোথা বন—কোথায় কুটীর!
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোতা কত শত
দেখায় ঝোপেরপ্রায় কানন গভীর!
* * *
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা,
কে কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথায়
বন গিরি লতা পাতা আঁধারে মিশায়!
* * *
অনন্ত তুষার মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মোহ স্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে—
চৌদিকে তুষাররাশি শিখর আবরি!

উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি—
জলদে মস্তক ঘিরি
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন!

*　　*　　*

অনন্ত আকাশ মাঝে একেলা কমলা!
অনন্ত তুষার মাঝে একেলা কমলা!
আকাশে শিখর উঠে—
চরণে পৃথিবী লুটে
একেলা শিখর পরে বালিকা কমলা!"[১]

এইরূপে মৃত্যুর মধ্যে প্রকৃতির সহিত মিলন চরম পরিপূর্ণতা লাভ করিল।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

তেরো চোদ্দ বছর বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথ যে এই আখ্যায়িকাটি নির্বাচন করিয়াছিলেন ইহা আমরা একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুগভীর সম্বন্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের নানাস্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপোবনকে আশ্রয় করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলন যে এই ভারতবর্ষেই একদিন চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এ কথা কবির মনকে চিরদিন নাড়া দিয়াছে। বাল্যকালেও কাব্যের বিষয় নির্বাচন করিবার সময়ে তিনি প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বালকসুলভ কল্পনায় তিনি বিজন কাননের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিলেন, প্রথম সর্গে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে কমলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু এই একান্ত স্বভাবগত সম্বন্ধের মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব ছিল—ইহা লোকালয়ের সংস্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারিল না, অষ্টম সর্গে কমলার সহিত বিজন কাননের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

"বনফুলের" মধ্যে বিজন কানন ও তপোবনের পার্থক্য সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। "তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত।" সেখানে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নহে, সমাজগতভাবে মানুষের

১। বনফুল, ৮ম সর্গ, ৮৭-৮৮, ৯১ ৯২ পৃঃ। জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্তিক, ৫৬৯ ৫৭১ পৃঃ।

সঙ্গে প্রকৃতির মিলন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত। কণ্বাশ্রমের পরিপূর্ণতা শকুন্তলার চতুর্দিকে এমন একটি অক্ষয় কবচ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল যাহা সংসারের সমস্ত দুঃখ-আঘাতেও বিনষ্ট হয় নাই এবং যাহা সকল বিপদ-বিক্ষোভের মধ্যেও শকুন্তলাকে রক্ষা করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে অন্য আরেকটি আশ্রম, মরীচির তপোবন "শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান" করিয়াছিল। বিজনকানন মানব-সমাজের সম্পূর্ণ বহির্বর্তী, সেইজন্য সেখানে পরিপূর্ণতার অভাব ঘটিয়াছে. বিজনকানন কমলার চরিত্রে এমন কোন শক্তিসঞ্চার করিয়া দেয় নাই যাহা সংসারের আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। অষ্টম সর্গে কমলা যে বনভূমিতে কোন আশ্রয় লাভ করিতে পারিল না তাহারও ঐ একই কারণ—বনভূমি তপোবন নহে।

বনভূমি ও তপোবনের পার্থক্য বালক কবি ইচ্ছা করিয়া দেখাইয়াছেন একথা বলিতেছি না, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেও বালক রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কমলার পরাজয়ের ভিতর দিয়া বিজনকাননের ব্যর্থতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তপোবনের সার্থকতা ও শকুন্তলার জয় ধ্বনিত হইয়াছে। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় সহানুভূতির ইহাও একটি নিদর্শন।

অন্যান্য কবির প্রভাব

বনফুলের ভাষা ও ছন্দ-রূপের আলোচনা করা হয় নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব এই সময়ের অনেক লেখার মধ্যেই দেখা যায়। "কবি-কাহিনী", "ভগ্ন-তরী" প্রভৃতি গাথা ও অন্যান্য গীতি-কবিতায় পরিচয় দিয়া তাহার পরে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। সেই সময়কার বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি নূতন সুর যোগ করিলেন তাহাও পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবিকাহিনী

এই খণ্ডকাব্যখানি প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) পৌষ ২৬৪-২৬৮ পৃষ্ঠা, ১ম সর্গ—২৩৮ লাইন, মাঘ ৩১৮—৩২৫ পৃষ্ঠা, ২য় সর্গ—৪২৫ লাইন, ফাল্গুন ৩৬০—৩৬০ পৃষ্ঠা, ৩য় সর্গ—১৫৫ লাইন, চৈত্র ৩৯৩—৩৯৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সর্গ—৩৬৭ লাইন, মোট ১১৮৫ লাইন। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে ষোল বৎসর।

"বনফুল" ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১২৮২-১২৮৩ সনের (১৮৭৫-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১২৮৬ সনে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) পুস্তকাকারে কবিকাহিনীই প্রথম প্রকাশিত হয়। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে—

"এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই 'বইখানা' ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা মনে করি না কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনো মতেই বলা যায় না।"[১]

গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থখানির আকার ৬¾″+৪⅛″ (১৭ মিমি × ১০.৫ মিমি) ডবল্ ফুল্‌স্‌ক্যাপ্ ১৬ পেজি ৩ ফর্মা ৬ পৃষ্ঠায় মোট, মুখপত্র+৫৩ পৃষ্ঠা; স্মল পাইকা অক্ষরে প্রতি পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন ছাপা। উৎসর্গ-পত্র নাই। কবিকাহিনীর এক লাইনও পরে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; বইখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য। নাম-পত্র (title page) এইরূপ—

১। জীবন-স্মৃতি—১০৮ পৃঃ।

কবিকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
ও
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক
প্রকাশিত।
কলিকাতা
মেছুয়াবাজার—রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে
সরস্বতী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত
সংবৎ ১৯৩৫।

আখ্যান-ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিকাহিনীর আখ্যান ভাগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজন মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিষটি।"[১]

১। জীবনস্মৃতি, ১০৩ পৃঃ।

প্রথম সর্গ

প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক কবির শৈশব কালের কথায় বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের মনে আদর্শ শিশুজীবনের ছবি কিরূপ ফুটিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই। শিশু কবি আপন মনে প্রকৃতির কোলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, মনের আনন্দে গান গাহিতেছে—

জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।[১]

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, যে, মানুষের যে-সকল আকাঙ্ক্ষা বাস্তব জগতে পূর্ণ হয় না, কল্পনার জগতে মানুষ তাহা সম্ভোগ করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনীর মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ীর ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার-রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না,—সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"[২]

কবিকাহিনীর শিশু কবি কিন্তু সখ্ মিটাইয়া বাহিরের জগতে খেলা করিয়া বেড়াইত।—

প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।

১। ভারতী, ১২৮৪, ২৬৪ পৃঃ। কবিকাহিনী, ১ পৃঃ।
২। জীবন-স্মৃতি, ১০ পৃঃ।

যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রুজলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।[১]

প্রকৃতির কোলে শুধু খেলা করা নহে, শিশু কবি গাছপালা পশুপক্ষীর সমস্ত খুটিনাটি বিষয়েরও খোঁজ রাখিত,—কোথায় পাখীরা গান করে, কোথায় ফুলগুলি ঢলিয়া পড়ে. কোথায় বাতাসে গাছের পাতা নাচিয়া উঠে !

বিজন কুলায় বসি গাহিত বিহঙ্গ
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি
কামিনীর গাছ হোতে পড়িল ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা।"[২]

প্রকৃতির কোলে খেলা করিবার জন্য এই প্রবল আগ্রহ ঐ অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বিস্তারিত প্রান্তরের মধ্যে শালের বীথি আমলকী কাননের ছায়ায় বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। কবিকাহিনীর শিশুকবিও রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে লোপ পায় নাই, "শারদোৎসবের" বালকদলও দিশাহারা হইয়া গাহিয়াছে—

কি করি আজ, ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই—
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই—
সকল ছেলে জুটি।[৩]

১। ভারতী ১২৮৪ ২৬৪-২৬৫ পৃঃ। কবি-কাহিনী, ১-২ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ১-২ পৃঃ। ভারতী, ১২৮৪, ২৬৪ পৃ।

৩। শারদোৎসব ২ পৃঃ।

শিশুকবি যেমন মায়ের কোল হইতে ছুটিয়া পালাইয়াছে, বালকদলও তেমনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়াছে—

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে!
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুট করে![১]

যাহা হউক শিশুকবির শৈশব ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। কবি যৌবনে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতির সহিত যোগ এখন আরও ঘনিষ্ঠ হইল।

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।[২]

কবি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তন্ময় হইয়া যাইত আপনার মনে কত ভাবনাই ভাবিত।

ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি-পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের 'পরে হবে প্রকাশিত:
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পুরিত;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন।[৩]

১। শারদোৎসব, ৪৯ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী', ৩ পৃঃ। ভারতী, ২৫৫ পৃঃ।

৩। কবিকাহিনী, ৪-৫ পৃঃ। ভারতী, ১৬৫ পৃঃ।

কল্পনাদেবী তখন কবির প্রতি অনুকূল—

কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া,
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।

* * *

নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীরতলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।[১]

রাত্রির অন্ধকারে যখন সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কবি তখন একাক পর্বতশিখরে উঠিয়া প্রকৃতির স্তবগান গাহিত।

সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না
কেবল আকাশ-ব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
কেবল পর্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান;
কেবল সুদূর-বনে দিগন্ত-বালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর-গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সম্মুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথ-বায়ু কাঁপাত পল্লব।[২]

পনেরো ষোল বৎসর বয়সে লেখা প্রকৃতি-স্তবের মধ্যেও কল্পনা-শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়; প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন—

১। কবিকাহিনী, ৫-৬ পৃঃ। ভারতী, ২৬৬ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ৬-৭ পৃঃ। ভারতী, ২৬৬ পৃঃ।

শত শত গ্রহতারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব-চরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন[১]!

ইহার পর নীহারিকা-পুঞ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা বলিয়াছেন—এই নিয়ম-বন্ধন যদি একবার কোথাও ছিন্ন হয় তবে কি ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ডই উপস্থিত হইবে!

এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে
কক্ষছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রতারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায়;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে।[২]

আরও কিছুদিন পরে "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" নামে একটি কবিতায় কতকটা এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রকৃতির রুদ্র-মূর্তি রবীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই আকর্ষণ করিয়াছে, পরবর্তীকালের লেখায় সর্বত্রই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বাল্যকালের লেখাটির মধ্যেও আমরা প্রকৃতির প্রলয়রূপের বন্দনা দেখিতে পাই।

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্বতচূড়া করেছে কম্পিত,

১। কবিকাহিনী, ৮ পৃঃ। ভারতী, ২৬৬ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী, ৭-৮ পৃঃ। ভারতী, ২৮৭ পৃঃ।

সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে.
তখন একাকী আমি পর্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব.
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়িছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি ।[১]

এই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুতরঙ্গে "দোলে রে প্রলয় দোলে" অথবা বর্ষশেষের "ঈশানের পুঞ্জমেঘ ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা" পর্য্যন্ত ঝড়ের বর্ণনায় কবির হাত কখনো কাঁপে নাই ।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "মোরে কর সভা-কবি ধ্যান-মৌন তোমার সভায় হে শর্বরী"; রাত্রি ও সন্ধ্যার স্তবও তিনি পরে অনেক লিখিয়াছেন; কিন্তু এই অল্প বয়সের লেখাতেও নিশীথ-রাত্রির সভাকবি হইবার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন ।

অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত ।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকশিত ।[২]

শুধু রাত্রি নয়, সঙ্গে সঙ্গেই আছে—

১। কবিকাহিনী, ৯ পৃঃ। ভারতী, ২৬৭ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী ৯-১০ পৃঃ। ভারতী, ২৬৭ পৃঃ।

কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষায়
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি।
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ বালারে—
যেদিকে দক্ষিণবধূ ফেলেন নিশ্বাস
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্তলক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।[১]

দ্বিতীয় সর্গ

প্রকৃতির কোলে এই ভাবে কবির জীবন কাটিতে লাগিল, কিন্তু কবির হৃদয় শূন্য থাকিয়া গেল—কিসের যেন অভাব থাকিয়া গিয়াছে—

এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পুরিবে না আর ?
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।[২]

এই পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ন সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল
* * * *
পারে না পুরিতে তারা, বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।[৩]

১। কবিকাহিনী, ১০ পৃঃ। ভারতী, ২৬৭-২৬৮ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী, ১২ পৃঃ। ভারতী, মাঘ, ১২৮৪, ৩১৮ পৃঃ।
৩। কবিকাহিনী, ১৩ পৃঃ। ভারতী, ৩১১ পৃঃ।

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষকেও ভালবাসিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।[১]

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বাদ দিয়া কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই।

কবিকাহিনীর নায়ক শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, একদিন অপরাহ্নে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িল।

হেনকালে ধীরি ধীরি, শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে
কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার,
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময়?
কি দুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ?[২]

বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিল, কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণ-কুটীরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটীর ওই,
চল যাই ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হোতে ফলমূল আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।[৩]

১। কড়ি ও কোমল।

২। কবিকাহিনী, ১৫ পৃঃ। ভারতী, ৩১৯ পৃঃ।

৩। কবিকাহিনী, ১৬ পৃঃ। ভারতী, ৩২০ পৃঃ।

"বনফুলে"র নায়িকা কমলার ন্যায় নলিনীর সহিতও বনের হরিণ বনের পাখী বনের গাছপালার একটি সুমধুর হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বনফুল-পরিচয়-প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতির সহিত মানুষের মিলনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল হইতেই মুগ্ধ করিয়াছে।

হরিণ-শাবক এক আছে ও গাছের তলে
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক।
দূরে সরসীর ধারে আছে এক চারুকুঞ্জ,
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন,
কত পাখী ডালে ডালে সারাদিন গাইতেছে
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখী এক আছে মোর, সে যে কত গায় গান,
নাম ধোরে ডাকে মোর 'নলিনী' 'নলিনী'।
যা আছে আমার কিছু, সব আমি দেখাইব,
সব আমি শুনাইব যত জানি গান।[১]

নলিনীর সহিত কবি কুটীরে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কবির মন নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে না পারায় কবির মন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সুখ বা দুখের কথা বুকের ভিতরে যাহা
দিনরাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয়-উচ্ছ্বাস-কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া,
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাহিক মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।[২]

১। কবিকাহিনী, ১৭ পৃঃ। ভারতী, ৩২০ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী, ১৯ পৃঃ। ভারতী ৩২১ পৃঃ।

কিন্তু এইভাকে বেশীদিন চলে না, একদিন কবি বালিকার কাছে গিয়া অশান্ত বালকের মত কত কি বলিয়া ফেলিল ; অসংলগ্ন কথা মনের ভাবকে প্রকাশ না করিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল।

কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা।

বালিকাও কবির কাছে নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করিল।

তাহার পর নলিনী ও কবির একত্র জীবনযাপনের কথা।

অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন সুখে,
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন ;
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু,
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
আলুলিত চুলগুলি সাজাইয়া বনফুলে
ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
একথা ও-কথা লয়ে, কি যে কি কহিত বালা
কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত।[১]

বালিকার মন প্রণয়ে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না।

শুধু সে বালিকা ভালবাসিত কবিরে।
শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।

* * *

শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার,
কিন্তু সে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ,
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়।[২]

বনবালিকার চরিত্রে কৃত্রিমতার আভাস মাত্র ছিল না, তাহার জীবন বনদেবতার মতনই সরল সহজ সুন্দর।

১। কবিকাহিনী, ২০ পৃঃ। ভারতী, ৩২১ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ২৩ পৃঃ। ভারতী, ৩২৪ পৃঃ।

আঁধার অমার রাত্রে. একাকী পর্বত-শিরে !
সেও গো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উন্মত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর
পর্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া.
তাহারো হৃদয় যেন নদীর তরঙ্গ সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব ।

* * *

বন-দেবতার মত এখন সে এলোথেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত, প্রভাতের বায়ু যথা,
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত ।[১]

কিন্তু এত সুখেও কবির মন তৃপ্ত হইল না.

এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢাল ভালবাসা হৃদয়ে আমার ।"

পনেরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিচরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন জগতের অনেক কবি সম্বন্ধে এ-সকল কথা খাটে ।

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু ।
অমন সমুদ্র সম আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবী নহে এ পৃথিবী ।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পুরায় তারা আকুল বিলাপে ।[২]

কবি বা শিল্পীর মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, কিছুতে তার সন্তোষ নাই. সে এক অভিজ্ঞতার পর আরেক অভিজ্ঞতা ভাঙিয়া নূতন নূতন শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে। কথাটা নূতন নহে, অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এত

১। কবিকাহিনী, ২১ পৃঃ। ভারতী, ৩২১-৩২২ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী, ২২ পৃঃ। ভারতী, ৩২২ পৃঃ।

অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ এই জিনিষটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যাহা হউক কবির অতৃপ্তি ঘুচিল না।

কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পুরিল না প্রাণের শূন্যতা"!
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি
"আরো দাও ভালবাসা হৃদয় ঢালিয়া।
আমি যত ভালবাসি, তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পুরিবে না প্রাণের শূন্যতা।[১]

বালিকা এ কথার কি উত্তর দিবে? সে ত কিছু বাকি রাখে নাই—

যা ছিল আমার কবি দিয়াছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি
সকলি তোমার প্রেমে দেছি বিসর্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।[২]

কবির মন কিন্তু তৃপ্ত হয় না—যা পাওয়া যায় না কবির মন চায় তাই।

"ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?
সারাদিন সাধ যায় শুনাই মনের কথা,
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া?
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা?
* * *
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।"[৩]

১। কবিকাহিনী, ২২ পৃঃ। ভারতী, ৩২৫ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ২২ পৃঃ। ভারতী, ৩২২ পৃঃ।

৩। কবিকাহিনী, ২৩ পৃঃ। ভারতী, ৩২২ পৃঃ।

মনের ভিতরে এই অতৃপ্তি, বাহিরের কোন জিনিষে মিটিবে না। কবি ঠিক করিল সে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইবে, অন্য দেশে অন্য লোকালয়ে কোথাও তৃপ্তি পায় কি না দেখিয়া আসিবে। কবি বালিকার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

বালিকা নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চোখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে, তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।

* * *

কবি ত চলিয়া যায়—সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে,
আঁধারে কাননভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে।

* * *

তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি,
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ণ সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।[১]

বালিকা গান করিতে লাগিল।

কেন ভাল বাসিলে আমায়?
কিছুই নাহিক গুণ, কিছুই জানি না আমি,
কি আছে? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয়?
যা আমার ছিল সাধ্য, সকলি করেছি আমি,
কিছুই করিনি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি,
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার?[২]

১। কবিকাহিনী, ২৭-২৮ পৃঃ। ভারতী, ৩২৪ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ২৮ পৃঃ। ভারতী, ৩২৪ পৃঃ।

তৃতীয় সর্গ

কবি কত দুর্গম নদী গিরি লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেল, কত দূর দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিল. নূতন লোকালয় দেখিল, কিন্তু তাহার হৃদয় শান্ত হইল না। কবির হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছে—কিছুই তাহার ভাল লাগে না, পাখীর গান নির্ঝরের ধ্বনিতেও কবির হৃদয় আর পূর্বের ন্যায় জুড়ায় না। নলিনীর বিরহে সমস্তই তাহার নিকট শূন্য ঠেকে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীর দিকে চাহিয়া কবি বসিয়া থাকে।

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা নীরব রজনী।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসী-বক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভ-প্রতিবিম্ব-শোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র-তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন!
স্নিগ্ধরাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
অধীর বসন্ত-বায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।[১]

এইরূপ নীরব রজনীতে কবির মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানি না কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া, উথলিয়া উঠে গো কেমন।[২]

যখন রাত্রি হইয়া আসে পুরানো সুখের কথা কবির মনে পড়ে, কবির মন উদাস হইয়া যায়।

১। কবিকাহিনী, ৩২ পৃঃ। ভারতী, ফাল্গুন, ৩৬১ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী, ৩২-৩৩ পৃঃ। ভারতী, ৩৬১ পৃঃ।

কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি !
কে আছে এমন যার এ হেন নিশীথে
পুরাণো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি ![১]

কবির ত এরূপ অবস্থা। ওদিকে বনবালিকা নলিনীও নিতান্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে অরণ্য-কুটীরে দিন কাটাইতেছে। তাহার সেই সরল হাসি সেই সদানন্দ প্রফুল্লভাব আর নাই—

আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে।
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির,
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ।[২]

বালিকা এখন মরণের দিন গুনিতেছে, মনে শুধু এক সাধ যে কবিকে দেখিয়া যেন মরিতে পারে।

কবির প্রত্যাবর্তন

ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কবি কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা,
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাহিছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি।[৩]

বাহিরের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই, যা-কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহা মানুষের হৃদয়ে; কবি অধীর হইয়া কুটীরের দিকে চলিল।

১। কবিকাহিনী, ৩৩ পৃঃ। ভারতী, ৩৬১ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ৩৪ পৃঃ। ভারতী, ৩৬২ পৃঃ।

৩। কবিকাহিনী, ৩৫ পৃঃ। ভারতী, ৩৬২ পৃঃ।

দুয়ারের কাছে গিয়া, দুয়ারে আঘাত দিয়া
ডাকিল অধীর স্বরে নলিনী নলিনী!
কিছু নাই সাড়াশব্দ, দিল না উত্তর কেহ,
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা' রোয়েছে পড়ি,
বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে।[১]

কবি আকুল হইয়া কাননে কাননে নলিনীকে খুঁজিল, কেহ সাড়া দিল না, শুধু ঘুমন্ত হরিণেরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কাতর কবি গিরিশৃঙ্গে গিয়া উঠিল।

দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে, শীতল তুষার পরে
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।[২]

নলিনীর ঘুম আর ভাঙ্গিল না, কবির সহিত তাহার আর দেখা হইল না। কবিকেও তাহার পর দিন হইতে সেই বনে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

নিকটের জিনিষ অবহেলা করিয়া মানুষ দূরে চলিয়া যায়, নিকটকে হারায় এবং দূরকেও পায় না, এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া বলিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে লেখা "ভগ্ন-হৃদয়" নামক নাটকখানিতে আরেক কবি নলিনীরই মত সরলা বালিকা মুরলাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কাছে থাকিতে বুঝিতে পারিল না যে সে মুরলাকেই ভালবাসে। দেশে দেশে ঘুরিয়া সে কবিও একদিন মুরলাকে খুঁজিল—

দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোথায়—কোথায়?
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধূ ধূ করিতেছে,
সে মাঠেতে অন্ধকার—বিস্তারিয়া বাহু তার—
ভূমিতে রাখিয়া মুখ কেঁদে মরিতেছে।

১। কবিকাহিনী, ৩৫ পৃঃ। ভারতী, ৩৬২ পৃঃ।
২। কবিকাহিনী, ৩৫-৩৬ পৃঃ। ভারতী, ৩৬২ পৃঃ।

কোথা তুই—কোথা মুরলা রে—
কোথা তুই গেলি বল্—শুধাইব কারে ?"১

মুরলার সঙ্গে যখন দেখা হইল, মুরলা তখন মৃত্যুশয্যায়। দেখা হইবার কিছু পরেই সব শেষ হইয়া গেল।

আরো কিছুদিন পরে, ২৮ বৎসর বয়সে লেখা "মায়ার খেলা"য় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই সুর বাজিয়াছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের-মত কারে খুঁজে মর'।
সে কি আছে ভুবনে।
সে যে রয়েছে মনে!

মায়াকুমারীরা বারবার গাহিয়াছে—

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!
মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।

আবার ষাট বৎসর বয়সে "তপতী"র কথা লিখিয়াছেন।

সাধনার একটা পর্ব শেষ ক'রে সে চোখ মেলে দেখ্‌লে কাঠকুড়ানি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম ফুলে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না, যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলো মনে পড়্‌চে না। * * তপস্বী দেখেও দেখলে না, আবার তপস্যায় মন দিলে। * * মেয়েটি একদিন বল্‌লে "প্রভু, আমি বহু দূরদেশে যাব, আমাকে আশীর্বাদ করো।" তপস্বী বল্‌লেন "যাও"। মেয়েটি চলে গেল। * * তারপর যখন তপস্যা পূর্ণ হল, যখন বর নেওয়ার সময় এল, ইন্দ্র জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কি চাও ?" তপস্বী তখন বল্‌লেন "এই বনের কাঠকুড়ানিকে"।

১। ভগ্নহৃদয়, ২৭শ সর্গ, ১৭৪ পৃঃ।

এই বয়সেই আবার লিখিয়াছেন পরীস্থানের রাজপুত্রের কথা

উদাস ঝোপের ধারে বনের মেয়ে কাজরীকে পেয়ে যার মন তৃপ্ত হল না, যে ভাবলে কাজরীর কালো চেহারার মাঝে পরী ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে। রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়েও যে রোজই কাজরীকে বলে "তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও, আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখ্‌তে চাই।" তারপর একদিন যখন কাজরী বললে "না, আমি আর ফাঁকি দেব না," যখন কার্তিকী পূর্ণিমার রাতে তিন প্রহরের বাঁশি বাজল, চাঁদ যখন পশ্চিমে হেলেচে, শোবার ঘরে বিছানায় শাদা আস্তরণের উপর রাশ করা কুন্দফুল ফেলে রেখে দিয়ে কাজরী যখন চলে গেল, তখন রাজপুত্র বুঝলে, চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায় তখন আর তাকে পাওয়া যায় না।[১]

অতএব দেখা যাইতেছে যে কবিকাহিনীর মধ্যেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল সুরের আভাস পাওয়া গেল। এইরূপ মূল সুরের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ সর্গ

চতুর্থ সর্গে নলিনীর মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাস, ক্রমে শান্তিলাভ ও পরে বৃদ্ধবয়সে কবির সুখ-দুঃখ ও আশার কথা এবং কবির মৃত্যু বর্ণনা করিয়া কাব্য শেষ হইয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"[২]

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথা খুব ঘটা করিয়া বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু

১। বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৩২৯, সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

২। জীবন-স্মৃতি, ১০৭ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিণত বয়সের লেখার সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে যতটা হাস্যকর মনে করিতেছেন আমরা সেরূপ মনে করি না।

নলিনীর মৃত্যুর পর কবির মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিল যে সত্যই কি সমস্ত ফুরাইয়াছে? যে মানুষ এমন একান্ত সত্য ছিল সে কি একমুহূর্তেই সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া গেল? মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই থাকিবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায় তাহাতে?

* * *

এই ভালবাসা, যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?[১]

শোকাচ্ছন্ন কবি তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া দেখিল কালস্রোতে সমস্তই ভাসিয়া চলিয়াছে কিছুই স্থির নাই।

হিমাদ্রির এই স্তব্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্তমান,
বর্তমান মিশিতেছে অতীত সমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীর মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্তনের পথে যেতেছে লইয়া।[২]

কবি বুঝিল কালস্রোতে সমস্ত চলিয়াছে কিন্তু কিছু বিলীন হইতেছে না, অনন্ত কালের মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কবি দেখিল পাখীরা গান করিতেছে কাননে বায়ু বহিতেছে, উপত্যকায় ফুল

১। কবি-কাহিনী ৩৮-৩৯ পৃঃ। ভারতী. চৈত্র, ১২৮৪, ৩৯৩ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ৪০ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৪ পৃঃ।

ফুটিতেছে, কেহ চুপ করিয়া বসিয়া নাই। প্রকৃতির প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কবি নিজের শোক ভুলিল।

ধীরে ধীরে দূর হতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।

*　　　*　　　*

কখনো মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর,
এমন স্বপনময় এমনি অস্ফুট ;
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে।[১]

কবির বার্দ্ধক্য

ক্রমে কবির বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। শ্বেতজটা-সমাকীর্ণ গম্ভীরমুখশ্রী বৃদ্ধ কবি হিমালয়ের পাদদেশে বসিয়া গান করিতেছেন।

কি সুন্দর সাজিয়াছো ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে,
একটি সন্ধ্যায় তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া তুষারশুভ্র মস্তক তোমার!

*　　　*　　　*

শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্বতের বনে বনে গাঢ়তর হল
ঘুমময় অন্ধকার, গভীর নীরব।

১। কবিকাহিনী, ৪৩ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৫ পৃঃ।

সাড়াশব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্বতের শতদল দিয়া।[১]

কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানব-সভ্যতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কত পাপ কত রক্তপাত কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া মানুষ কিরূপ হীনতায় নিমজ্জিত হয় তাহা দেখিয়াছে—

দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীয়া॥
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
যে হাত ভ্রাতারে তার পরায়ে শৃঙ্খল,
সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন. সে অধীনের দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্বলের পীড়িতে কেবল,
দুর্বল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জিতে![২]

অন্য দিকে সভ্যতার নামে কি অত্যাচারই চলিয়াছে।

সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা,
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া.
তবুও মানুর বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার![৩]

এইসব কথা স্মরণ করিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু

১। কবিকাহিনী, ৪৪-৪৫ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৫ পৃঃ।

২। কবিকাহিনী, ৪৭ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৬ পৃঃ।

৩। কবিকাহিনী, ৪৮ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৬-৩৯৭ পৃঃ।

তথাপি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না, আসন্নমৃত্যু কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শান্তিলাভ করিলেন—

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি ;
নাহিক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা ;
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !

* * *

সে দিন আসিবে গিরি এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব-হৃদয় ।[১]

কবি কিন্তু জানেন সে দিনের এখনো দেরি আছে—

প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয় ।[২]

পনেরো ষোল বৎসর বয়সের লেখায় বিশ্বপ্রেমের যে আদর্শ ফুটিয়াছে তাহা খুব গভীর না হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ বটে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শ কবিজীবনের কথা কল্পনা করিয়াছেন তখন জগৎজোড়া শান্তি, সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দিয়াই কবিচরিত্রের শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন,

---

১। কবিকাহিনী, ৪৯-৫০ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৭ পৃঃ।
২। কবি-কাহিনী, ৪১ পৃঃ। ভারতী, ৩৯৮ পৃঃ।

স্বাদেশিকতার আদর্শ বা স্বাজাত্যবোধের চরম অভ্যুদয়কে উজ্জ্বল করিয়া তুলেন নাই

কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস বনফুলের ন্যায় কবিকাহিনীর বিষয় নির্বাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্তা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ যখন কবিকাহিনী লিখিয়াছেন তখন হয়ত নিজেই জানিতেন না যে সেই লেখার মধ্যে তাঁহার নিজের পরবর্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেমানুষী হইলেও এই বয়সের লেখায় বিশ্বপ্রেমের কথাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি—

"কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছ্বাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে তাহার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সর্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণ বয়সের আরম্ভে এও সেই রকম একটা কাণ্ড।"[১]

১। জীবন-স্মৃতি, ১০৬ পৃঃ।

রুদ্রচণ্ড

কবিকাহিনীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা রীতিমত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের ষোল হইতে আঠারো বৎসর বয়সের লেখা প্রায় সাড়ে তিন হাজার লাইন গীতিকবিতা ১২৮৪—১২৮৭ সালের (ইংরেজী ১৮৭৭—১৮৮০) ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। গীতিকবিতা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। "রুদ্রচণ্ড" নামক নাটিকাখানিও এই বয়সেই লেখা, ইহা প্রথমে কোন মাসিকপত্রে বাহির হয় নাই, ১২৮৮ সনে (ইংরেজি ১৮৮১, শকাব্দ ১৮০৩, সম্বৎ ১৯৩৫) একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পরিচয়

"রুদ্রচণ্ডের" আকার ৭¼ ইঞ্চি × ৪½ ইঞ্চি (১৮'৫ মিমি × ১১'৫ মিমি) ১ পৃষ্ঠা উপহার + ৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপহার ১৩ লাইন, চতুর্দশ সর্গে ৭৮৭ লাইন, মোট ৮০০ লাইনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। নাম-পত্র (title-page) এইরূপ :—

রুদ্রচণ্ড

(নাটিকা)

———

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

——

কলিকাতা

বাল্মিকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮০৩।

প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য ।০ (আট আনা)। পরে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই ; গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। দুইটি গান কাব্য-গ্রন্থাবলীর

১৩০৩ সনের সংগ্রহে "কৈশোরকের" মধ্যে ছাপা হইয়াছিল; প্রচলিত সংস্করণে কিছুই নাই।

বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকায়—No. 1268 (3rd quarter of 1881)। ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।[১]

উপহার

গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপহার কবিতাটি এইরূপ :—

ভাই জ্যোতিদাদা,

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই!
কোথাও পাইনে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই।
আগ্রহে অধীর হ'য়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিয়াছি ছুটিয়া তোমার পাশ,
দেখিতে পারিলে তাহা মিটিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে ভাই ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে!
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি' যেতে হবে পরবাসে,
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই।

প্রবাসে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে, "রুদ্রচণ্ড" নাটিকাটিকে ষোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।

১। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

আখ্যানভাগ

রুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুর-অধিপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছেন। এখন অরণ্যে অরণ্যে রুদ্রচণ্ডের দিন কাটিতেছে, একমাত্র প্রতিশোধস্পৃহা রুদ্রচণ্ডকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নাটিকা আরম্ভ হইয়াছে রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরব-প্রতিমার সম্মুখে। নিজ সংকল্প-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুদ্রচণ্ড ভৈরব-পূজায় আসীন।

মহাকাল ভৈরব মুরতি,
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি!
কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কাঁপিছে ভব
প্রলয়-গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন,
তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
অমাবস্যা রাত্রিরূপে ছেয়েছে ভুবন।
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি,
দশন-বিদ্যুৎ-বিভা দিগন্তে খেলায়।
তোমার নিশ্বাসে খসি, নিভে রবি নিভে শশী,
শতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।
প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের শ্মশানেতে
প্রেত-সহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে,
নিদারুণ অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে করপুটে।
প্রলয়-মুরতি ধর, থরহর স্থর নর,
চারিপাশে দানবেরা করুক বিহার,
মহাদেব শুন শুন, নিবেদিনু পুনঃ পুনঃ'
আমি রুদ্রচণ্ড, সেবক তোমার।[১]

রুদ্রচণ্ডের মনে শুধু এক চিন্তা—প্রতিহিংসা। রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়ার মনে কিন্তু এসব কোন ভাবনা নাই, সে ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথে, আপন মনে গান করিয়া যায়, তাহার এসমস্ত ছেলেখেলা রুদ্রচণ্ড একেবারেই দেখিতে পারে না। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ। তিনি অনেক সময়ে

১। রুদ্রচণ্ড, ১ম দৃশ্য, পৃঃ ১-২।

অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন। পৃথ্বীরাজ-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি অমিয়ার সহিত আলাপ করিবে এ ধৃষ্টতা রুদ্রচণ্ডের নিকট অসহ্য। রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়া বলিয়া দিল, যে চাঁদকবিকে পুনরায় অমিয়ার নিকটে দেখিতে পাইলে চাঁদকবির আর নিস্তার নাই। রাত্রির অন্ধকারে কুঠারহস্তে অরণ্যের পাদপ কাটিতে কাটিতে রুদ্রচণ্ড ভাবিতে লাগিল পৃথ্বীরাজকে নিজ হস্তে যন্ত্রণা দিয়া অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে। এইরূপ চিন্তায় অনেক সময় রুদ্রচণ্ডের সারারাত ঘুম হইত না, সে রাত্রিতে রুদ্রচণ্ড ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে রুদ্রচণ্ড আবার দেখিল যে চাঁদকবি অমিয়াকে গান শুনাইতেছে। তখন আর তাহার সহ্য হইল না, রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে আক্রমণ করিল। রুদ্রচণ্ডের শরীরে আর পূর্বের ন্যায় বল নাই, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল। কিন্তু রুদ্রচণ্ডের সংকল্প এখনও সিদ্ধ হয় নাই, রুদ্রচণ্ডের প্রতিহিংসাতৃষ্ণা এখনও মিটে নাই,রুদ্রচণ্ড চাঁদকবির নিকট প্রাণ-ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু এই প্রাণ-ভিক্ষা চাওয়ার অপমান রুদ্রচণ্ডের মনে দারুণ শেলের ন্যায় আঘাত করিল।

জীবন মাগিতে হল তোর কাছে আজ,
শতবার মৃত্যু এই হইল আমার!
রুদ্রচণ্ড যে মুহূর্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে
রুদ্রচণ্ড সে মুহূর্তে গিয়াছে মরিয়া!
আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম ল'য়ে
কেবল শরীর তা'র, কহিতেছি তোরে—
এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন![১]

চাঁদকবি প্রাণ-ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল! রুদ্রচণ্ড কিন্তু অপমান ভুলিতে পারিল না।

অনুগ্রহ ক'রে মোরে চলে গেল চাঁদ!
গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্ন-বদনে

১। রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ২০।

রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেন অনুগ্রহ ক'রে ?
অনুগ্রহ ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা

*   *   *

ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয় !
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে
তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব ।[১]

প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য রঘুপতিও একদিন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, এবং ভিক্ষা-লব্ধ দুইদিনের কলঙ্কে রঘুপতির সমস্ত গর্ব সমস্ত তেজ নিভিয়া গিয়াছিল। রুদ্রচণ্ডের মধ্যে রঘুপতি-চরিত্রের পূর্বাভাস দেখিতে পাই।

যাহা হউক অনুগ্রহ-ক্ষুব্ধ রুদ্রচণ্ড রোষে অপমানে জ্বলিতে লাগিল। অমিয়ার জন্যই এই অপমান, রুদ্রচণ্ডের নিকট অমিয়াও দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। অমিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাওয়াতেও কোন ফল হইল না।

রুদ্রচণ্ড। শিশুর হৃদয় একি পেয়েছিস তুই।
দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস্।
এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্ তুই।
অশ্রুজলধারা মোর দু' চক্ষের বিষ।
আর নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার
দূর হ' রে—

অমিয়া। ধর পিতা, ধর গো আমায়—
রুদ্রচণ্ড। ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে মোরে, রাক্ষসি, ছুস্‌নে।[২]

অমিয়া বিষণ্ণ-হৃদয়ে চাঁদকবির সন্ধানে রাজধানীতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছে। এক দূত রুদ্রচণ্ডের সন্ধানে অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত। রুদ্রচণ্ডের কুটীর এমন অন্ধকার যে দূত পথ দেখিতে পায় না।

১। রুদ্রচণ্ড, ৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ ২১।
২। রুদ্রচণ্ড, ৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ ২৩।

দূত। একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার!
চারিদিকে ঝোপঝাপ পথ নাহি কোথা!
ওই বুঝি হবে তার আঁধার কুটীর,
ওইখানে রুদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি![1]

রুদ্রচণ্ড মানুষ সহ্য করিতে পারে না, দূতকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। পথ ভুলে বুঝি তুই এসেছিস্ হেথা?
আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগর-নিবাসী তোরা হেথা কেন এলি?
ঐশ্বর্য্য মাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস্,
ননীর পুতুল যত ললনারে ল'য়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, গদগদ ভাষা,
ফুলের পাপ্‌ড়ি পরে পড়িলে চরণ
ব্যথায় অধীর হ'য়ে উঠিস্ যে তোরা
নগর-ফুলের কীট হেথা তোরা কেন?
আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড।
মৃদু মিষ্ট কথা শুনি আহ্লাদে গলিয়া
রাজ্য-ধন উপহার দিইনাক আমি![2]

দূত বুঝাইয়া বলিল যে সে কোন অপকার করিতে আসে নাই।

দূত। রুদ্রচণ্ড! মিছে কেন করিতেছ রোষ!
উপকার করিতেই এসেছি হেথায়।[3]

উপকারের কথা শুনিয়া রুদ্রচণ্ড আরও জ্বলিয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ!
তোমরা নগরবাসী স্ফীত দেহ সবে
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত!

১। রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃঃ ২৯।
২। রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃঃ ২৯-৩০।
৩। রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃঃ ৩১।

তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে।[১]

দূত তখন জানাইল যে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, ঘোরী রুদ্রচণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। রুদ্রচণ্ড এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া সে পৃথ্বীরাজকে নিজ হস্তে শাস্তি দিবার সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, আজ মহম্মদ ঘোরী বুঝি রুদ্রচণ্ডের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়! অপরের হস্তে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে রুদ্রচণ্ডের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না। রুদ্রচণ্ড দূতকে দূর করিয়া দিল এবং ঘোরীর আক্রমণ-বার্তা প্রচার করিবার জন্য রাজধানী যাত্রা করিল।

রাজধানীতে আসিয়া রুদ্রচণ্ডের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, এত লোক এত কোলাহল তাহার সহ্য হয় না।

রুদ্রচণ্ড। একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে, সহস্র বর্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!

* * *

যেথা যাই শত আঁখি মোর মুখ চেয়ে
আঁখিগুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে!
যেথা হেরি চারিদিকে সূর্য্যের আলোক
নয়ন বিঁধিছে মোরে বানের মতন![২]

কিন্তু পৃথ্বীরাজের সংবাদ না পাইলে ত চলিবে না। ভিক্ষা-চাহিয়া-পাওয়া জীবন রুদ্রচণ্ডের নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, পৃথ্বীরাজকে না পাইলে রুদ্রচণ্ডের জীবনের অভিলাস পূর্ণ হইবে না। রুদ্রচণ্ড রাজধানীর পথে পথে খবর লইয়া বেড়াইতেছে যে পৃথ্বীরাজ বাঁচিয়া আছেন কি না, এমন সময়ে একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। রুদ্রচণ্ডের এ কথা শুনিয়া তাহার নিকট সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, দূতকেই সে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

১। রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃঃ ৩১।
২। রুদ্রচণ্ড, ৯ম দৃশ্য, পৃঃ ৩৮।

রুদ্রচণ্ড। হত? সেকি কথা? মিথ্যা বলিসনে মূঢ়!
মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃথ্বীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ।
কোথা যাস, বল্ তুই এখনো সে আছে।[১]

দূত চলিয়া গেলে রুদ্রচণ্ড বুঝিল পৃথ্বীরাজ সত্যই মরিয়াছে। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই রুদ্রচণ্ড বাঁচিয়া ছিল, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল, রুদ্রচণ্ডের জীবন শূন্য হইয়া গেল।

রুদ্রচণ্ড। মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল।
শূন্য হ'য়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,
তা'রে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর-কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।[২]

রুদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবন ধারণ করিবার আর কোন হেতু রহিল না, সে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল।

যদিও রুদ্রচণ্ড এই নাটিকাখানির প্রধান পাত্র, তথাপি অমিয়ার করুণ কাহিনী নাটিকার মধ্যে একটি সামান্য জিনিষ নহে। অমিয়ার মনে প্রতি-হিংসার কোন ভাব ছিল না, সে আপন মনে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিত, তরুদেহে লতা জড়াইয়া দিত, আন্‌মনে গান গাহিত। পিতাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত; কিন্তু পিতা যে কেন তাহাকে তিরস্কার করিতেন তাহা সে কিছুই

১। রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৪-৪৫।
২। রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৫—৪৬।

বুঝিতে পারিত না। চাঁদ-কবিকে সে এত ভালবাসে অথচ পিতা যে চাঁদ-কবিকে কেন দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না তাহা সে ভাবিয়া পায় না। রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদকবির সহিত দেখা পর্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, অমিয়ার মন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি।
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জ্যোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া ![১]

আঁধার-ভ্রূকুটীময় অরণ্যে কঠোর শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাহার আরো কতদিন কাটিবে, কে জানে! একমাত্র চাঁদকবিকে দেখিয়া নিজের সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ জীবনের কথা সে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া থাকিতে পারিত, এখন তাহাও বন্ধ হইল—

পরদিন প্রাত:কালে চাঁদকবি অমিয়ার কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য দুইটি গান রচনা করিয়া আনিয়াছি।" অমিয়ার হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপিতেছে, সে চাঁদ-কবিকে চলিয়া যাইতে বলিল। বলিয়াই মনে হইল তবে ত চাঁদ-কবির সহিত আর কখনও দেখা হইবে না। তাহার পর আবার ভাবিল অমিয়ার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটুক, চাঁদকবি যেন নিরাপদে থাকেন। অমিয়া তখন চাঁদ-কবিকে চলিয়া যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল, চাঁদকবি কিন্তু সমস্ত কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অমিয়ার একবার মনে হইল যে তাহার পিতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে কি তিনি কিছুই বুঝিবেন না! অমিয়া চাঁদকবিকে বলিল—

পিতারে বুঝায়ে তুমি বল একবার!
বোলো তুমি অমিয়ারে ভালবাস বড়,
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে!
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো
তুমি যদি ভাল ক'রে বলো বুঝাইয়া
নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা![২]

১। রুদ্রচণ্ড, ২য় দৃশ্য, পৃ: ৯।
২। রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃ: ১৩।

চাঁদকবি বলিলেন, "আচ্ছা বলিব। কিন্তু ও কথা এখন থাকুক, তোমাকে সে দিন যে গানটি শিখাইয়া দিয়াছি সেই গানটি আমাকে শুনাও।" অমিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

রাগিণী—মিশ্র ললিত।

বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল—
বসন্ত-লাবণ্যে সাজি গো;
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!

ঊষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা.
হরসে কপোল তার রাঙা!
আকাশ সুনীল আজি কিবা
অরুণ নয়নে হাস্য-বিভা,
বিমল শিশির-ধৌত তনু
হাসিছে কুসুম-রাজি গো;
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!

মধুকর গান গেয়ে বলে—
"মধু কই, মধু দাও দাও!"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে—"এই লও, লও!"
বায়ু আসি কহে কানে কানে—
"ফুলবালা, পরিমল দাও!"

আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল—
"যাহা আছে সব ল'য়ে যাও!"
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে—
নূতন জগৎ দেখি রে
আজিকে হরষ একি রে![1]

গান শেষ হইলে চাঁদকবি বলিলেন, "এইবার আমি একটি গান শিখাইয়া দি", বলিয়া তিনি গাহিতে লাগিলেন—

রাগিণী—মিশ্র গৌড় সারঙ্গ।

তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একলা পড়িয়া—
চারিদিকে কেহ নাহি আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু শিশিরের কণা?
কেহ না—কেহ না।

মধুকর কাছে এসে বলে—
"মধু কই, মধু চাই চাই।"
ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে—"কিছু নাই নাই।"
"ফুলবালা পরিমল দাও"
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে,
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে—"আর কিবা আছে?"

১। রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য. পৃঃ ১৪-১৫। কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩) কৈশোরক পৃঃ ৪-৫।

মধ্যাহ্ন-কিরণ চারিদিকে,
খর দৃষ্টি চেয়ে অনিমিষে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।[১]

এমন সময়ে রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত। অমিয়া কি করিয়া চাঁদকবিকে রক্ষা করিবে তাই ভাবিয়া আকুল; সে সমস্ত দোষ নিজের মাথায় পাতিয়া লইল।

অমিয়া। পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে;
আপনি এসেছি আমি চাঁদকবি কাছে,
চাঁদের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল!
এসেছিনু কিছুতেই পারিনি থাকিতে,
নিজে এসেছিনু আমি, চাঁদের কি দোষ?[২]

চাঁদকবির সহিত রুদ্রচণ্ডের যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, অমিয়া তখন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদকবির নিকট প্রাণভিক্ষা করিলেন অমিয়ার মূর্ছা তখনও ভাঙ্গে নাই। ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে দূত আসিয়া চাঁদকবিকে জানাইল যে রাজ্যের সমূহ বিপদ, রাজসভায় চাঁদকবির উপস্থিতি এখনই আবশ্যক, নিমেষ ফেলিবার অবসর নাই। অমিয়ার সহিত কথা বলিবার আর অবসর ঘটিল না, চাঁদকবি চলিয়া গেলেন।

তাহার পর অমিয়া যখন চাঁদকবিকে খুঁজিবার জন্য রাজধানীতে আসিল, চাঁদকবি তখন মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন। অমিয়া সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া চাঁদকবির দেখা পাইল না। রাত্রির অন্ধকারে ঝড় উঠিয়াছে, দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে;—এই ভীষণ দুর্যোগে অমিয়া হতাশ-হৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বনের এক কাঠুরিয়া তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় অমিয়ার প্রাণরক্ষা হইল।

এদিকে চাঁদকবি অমিয়ার জন্য ভাবিয়া আকুল, শিবিরে বসিয়া শুধু অমিয়ার কথা মনে পড়িতেছে।

১। রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ১৭-১৮। কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩), কৈশোরক, পৃঃ ৫।
২। রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ১৮।

সহস্র থাকুক্ কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা।
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ'অত্যাচার।

*   *   *   *

প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী,
কবে এ আঁধার রাত্রি ফুরাইবে তোর ?
ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে
গান গাবি খেলাইবি প্রশান্ত হরষে।[১]

আবার দূত আসিয়া খবর দিল যে শত্রুসৈন্য রাত্রিযোগে অলক্ষ্যে আসিয়া তিন ক্রোশ দূরে শিবির ফেলিয়াছে, এখনি যুদ্ধসজ্জা করিতে হইবে। চাঁদকবি সৈন্যদলকে প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া গেলেন, অমিয়ার সহিত আর দেখা করা হইল না।

বেলা দ্বিপ্রহরে রাজধানীর পথে দলে দলে লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিয়াছে, সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। নেপথ্যে অমিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে, বিদায়ের পূর্বে চাঁদকবি যে গান তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সেই গানটি।—

তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।
চারিদিকে কেহ নাহি তার—
নিরদয় অসীম সংসার।"

চাঁদকবি একদল সৈন্যকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল যেন অমিয়ার কণ্ঠ শুনিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে মধ্যাহ্নে রাজপথে সে কি করিয়া আসিবে। একজন সেনাপতি আসিয়া সংবাদ দিল যে হিন্দুসৈন্য যুদ্ধশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত, সাহায্যের আশায় এখন একটা করিতেছে, বিলম্ব হইলে তাহারা হতাশ হইয়া পড়িবে। চাঁদকবি বলিলেন "তবে চল ত্বরা, আর দেরী নয়।" এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া ডাকিল—

১। রুদ্রচণ্ড, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, পৃঃ ২৭।

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ—ভাই মোর—
সৈন্যগণ। কে তুই! দূর হ'।
সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়, চল সৈন্যগণ!
চাঁদকবি। (স্তম্ভিত হইয়া) অমিয়া রে—
সেনাপতি। চাঁদকবি, এই কি সময়!
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেলে একি পথের ধারেতে?
চল' চল' বাজাও বাজাও রণ-ভেরী!
চাঁদকবি। (যাইতে যাইতে) অমিয়া রে, ফিরে এসে—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি!
[রণবাদ্য। সৈন্যগণের সহিত চাঁদকবির প্রস্থান।][1]

দুন্দুভির শব্দে চাঁদ-কবির কথা ডুবিয়া গেল, অমিয়ার কানে কোন কথা পৌঁছিল না। অমিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না, অবসন্নহৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, রাজধানী পথ নিস্তব্ধ। অমিয়ার মনে শুধু এক কথা—

চলে গেল!—সকলেই চ'লে গেল গো!
দিনরাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্তের তরে দেখা হ'ল যদি,
চ'লে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না অমিয়া বলিয়া?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো?[2]

চলিতে চলিতে অমিয়া সেই অরণ্যের পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমিয়া ভাবিল আর কোথাও যখন আশ্রয় মিলিল না পিতার নিকটেই ফিরিয়া যাই, সে অরণ্যে ফিরিয়া চলিল। তার হৃদয় কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মা গো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর!
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিঁড়ে গেল সব।

১। রুদ্রচণ্ড, ৮ম, দৃশ্য, পৃঃ ৩৫-৩৬।
২। রুদ্রচণ্ড, ১০ম দৃশ্য, পৃঃ ৪০।

চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হ'ল যদি,
একবার ডাকিলে না অমিয়া বলিয়া ?[১]

অরণ্যে ফিরিয়া আসিয়া অভাগিনী দেখিল যে পিতা নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন। অমিয়া পিতার পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল।

অমিয়াকে দেখিয়া রুদ্রচণ্ড চমকিয়া উঠিল। এতদিন পরে আজ মরিবার সময় তাহার মনে পড়িল যে তাহার কন্যা আছে। প্রতিহিংসা-বৃত্তির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া রুদ্রচণ্ডের পিতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা।
এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর,
আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে।
আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন।

এতদিন পরে অমিয়া এই প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় পাইল, সে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

অমিয়া। ও কথা বোল না পিতা, বোল না, বোল না।
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর।
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার,
এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হয়ে।
যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
তোমারে তিলেক তরে ছাড়িব না আর।

আসন্ন-মৃত্যু রুদ্রচণ্ড কন্যাকে বুকে টানিয়া লইল।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা আমার তুই থাক বুকে থাক্।
সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিনু!
এখন সময় মোর ফুরায়ে এসেছে,
আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা ?

* * *

১। রুদ্রচণ্ড, ১০ম দৃশ্য, পৃঃ ৪১।

অমিয়া মা, কাঁদিসনে, থাক্ বুকে থাক্।[১]

এদিকে মহম্মদ-ঘোরী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়াছে, পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত। চাঁদকবি ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়া চলিয়াছেন।

চাঁদকবি। পৃথ্বীরাজ, রাজদণ্ড, দোর্দণ্ড প্রতাপ,
হাসি-কান্না লীলাময় নগর নগরী,
অচল অটল কাল ছিল বর্তমান,
আজ তার কিছু নাই। চিহ্নমাত্র নাই!
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল,
এ কি সব শ্মশানেতে মরীচিকা আঁকা![২]

এ সমস্তের মধ্যেও কিন্তু চাঁদকবির মনে পড়িতেছে অমিয়ার কথা। চাঁদকবি আর থাকিতে পারিলেন না, অমিয়ার সন্ধানে অরণ্যে চলিলেন। কুটীরের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে সমস্ত নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। পদশব্দে প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া উঠিতেছে, হাহা করিয়া বায়ু বহিতেছে। সন্তর্পণে কুটীরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া চাঁদকবি দেখিলেন রুদ্রচণ্ডের মৃত-দেহের পাশে মুমূর্ষু অমিয়া। আকুল কণ্ঠে অমিয়াকে ডাকিলেন—

অমিয়া, অমিয়া, স্নেহের প্রতিমা,
চাঁদকবি ভাই তোর এসেছে হেথায়।

১। রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৬-৪৭।

২। রুদ্রচণ্ড, ১৩শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৮।

পথ-মোচন

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রশ্ন সহজ হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা ফেল্ করিতে থাকে। এক-একটি সহজ বিষয়ও নানা প্রকার কল্পিত রূপক অর্থের আবরণে চাপা পড়িয়া যায়, নিতান্ত সহজ কথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আতিশয্যে ঝাপ্সা বলিয়া মনে হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও দেখা যায় যে একটি বিশেষ তত্ত্ব-কথা বা একটি বিশেষ রূপক অর্থ আবিষ্কার করিবার ঝোঁকে অনেক সময়ে লোকে মূল বিষয়টিকে ভুলিয়া যায়, আসল কথাটি সহজ বলিয়াই লোকে ভুল বুঝে। "মুক্তধারা" নাটকখানি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য গোড়াতেই "মুক্তধারার" সহজ অর্থটিকে সহজ ভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা দর্কার।

(১)

নাটকখানির সম্মুখে সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে নানা মানুষের চলাচলের পথ; দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা অসুরের মত হাঁ করিয়া রহিয়াছে, অপর দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল; পিছনে বাঁধন-বাঁধা "মুক্তধারা", জলের শব্দ আসিয়া পৌঁছিতেছে কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না; মাঝে মাঝে ভৈরব-মন্ত্র শুনা যাইতেছে—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর।

আর এই সমস্তের মাঝখানে রহিয়াছেন উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ।

অভিজিতের জন্ম রাজ-বাড়িতে হয় নাই মুক্তধারা ঝর্ণা-তলা হইতে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার কপালে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে যুবরাজ করা হইয়াছে। অভিজিৎ এ খবর জানিতেন না, তবুও ঝর্ণার শব্দে পথের সুরে তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠিত। গৌরীশিখরের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ ভাবিতেন—"যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম

পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখ্‌তে পাচ্চি—দূরকে নিকট কর্‌বার পথ।”

একদিন যুবরাজ শুনিলেন যে মুক্তধারার উৎসের নিকটে কোন্‌ ঘরছাড়া মা তাঁহাকে জন্ম দিয়াছে। অভিজিৎ বুঝিলেন যে তাঁহার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তাঁহাকে পথে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, ঘরের শঙ্খ তাঁহাকে ঘরে ডাকে নাই। ইহার পর হইতে যুবরাজকে অনেক সময়েই আর রাজবাড়িতে দেখা যাইত না, তিনি রাজবাড়ি ছাড়িয়া ঝর্‌ণাতলায় চলিয়া যাইতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—“ঐ জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই”, বলিতেন—“আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাট্‌বার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেচে।”

যুবরাজকে তখন শিবতরাইয়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া মুক্তধারার নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অভিজিৎ কিন্তু মুক্তধারার মাতৃভাষা ভুলিতে পারিলেন না। শিবতরাইয়ের অন্নচলাচলের পথ বন্ধ করিবার জন্য অনেকদিন হইল নন্দিসঙ্কটে গড় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, অভিজিৎ এই বহু-দিনের পুরাতন গড় ভাঙিয়া নন্দিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দিলেন। উত্তরকূটের স্বার্থে আঘাত লাগায় উত্তরকূটের অধিবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যুবরাজ অভিজিৎকে উত্তরকূটে ফিরিয়া আসিতে হইল।

অভিজিৎ উত্তরকূটে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই দেখিলেন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধা হইয়া গিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই বাধ্য করা যায় নাই। এতদিন পরে যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে বশ মানাইবার উপায় করিয়া দিয়াছে, শিবতরাইয়ের প্রজাদের পিপাসার জল এইবার বন্ধ করা চলিবে, শিবতরাইয়ে দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায়। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক উৎসব করিতেছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির প্রশংসায়, যন্ত্র-মহিমা-জয়গানে সমস্ত নগরী মুখরিত।

কিন্তু এই বাঁধ ত সহজে বাঁধা হয় নাই। বাঁধ বারবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত লোক ধূলাবালি চাপা পড়িয়াছে, কতলোক বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যায় নাই তখন রাজার আদেশে প্রত্যেক ঘর হইতে আঠারো বৎসরের উপর বয়সের যুবককে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে নাই। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর যন্ত্র-শক্তি জয়ী হইয়াছে। মায়ের ক্রন্দন কিন্তু থামে

নাই। জয়োৎসবের মধ্যেও শুনা যাইতেছে, জনাই গ্রামের অম্বা কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—"সুমন! আমার সুমন! বাবা আমার সুমন এখনো ফিরল না!······তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেচে। বাবা সুমন! সূর্য্য ত অস্ত যায়—আমার সুমন'ত এখনো ফিরল না!"

উস্কোখুস্কো-চুল হাতে বাঁকা ডালের লাঠি পাগল বটুক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—"সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও। ·······বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না·· ···সাবধান, বাবা সাবধান, যেওনা ও পথে।"

একদিকে নাগরিকদিগের উৎসবকোলাহল, অপর দিকে মায়ের ক্রন্দন, পাগলের অভিশাপ, তার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইতেছে—

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর!

যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়া এ সমস্তই দেখিলেন। পাগল বটুক আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল—"জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ বলি চায়।" অম্বা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সুমন! বাবা সুমন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাওনি?"

যুবরাজ বুঝিলেন যে রাজপ্রাসাদের শাসন-নীতির সহিত তাঁহার জীবনের কোন সত্য মিলন ঘটা সম্ভবপর নহে। মুক্তধারার উৎসের নিকট তাঁহার জন্ম, পথ খুলিয়া দিবার আহ্বানটিকে তাঁহার অন্তরতম চৈতন্যের মধ্যে ধারণ করিয়া তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, তাই অভিজিৎ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজগৃহে তাঁহার স্থান নাই। ভাই-বোনের সম্বন্ধের ন্যায় অভিজিতের সহিত মুক্ত-ধারার যোগ ভিতরে বাহিরে; এই ভিতরকার যোগের পরিচয় তিনি বাহিরের ঘটনার মধ্যেও দেখিতে পাইলেন, সেইজন্যই মুক্ত-ধারার বাঁধ-বাঁধার বেদনা অভিজিৎকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করিল। অভিজিতের মনে হইল—"মানুষের ভিতরের রহস্য বিধাতা বাহিরের কোথাও না কোথাও

লিখে রেখেছেন ; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝ্‌তে পার্‌লুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।" অভিজিৎ রাজকুমার সঞ্জয়কে বলিলেন—"আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে' যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।" অভিজিৎ বুঝিলেন প্রাণ দিয়াও মুক্তধারার বাঁধ তাঁহাকে ভাঙিতেই হইবে।

এমন সময় রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া যুবরাজ কারাগারে বন্দী হইলেন। তখন সূর্য্য ডুবিতেছে, যন্ত্রের চূড়াটা সূর্য্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়িয়া উদ্যতমুষ্টি দানবের মত দাঁড়াইয়া রহিল, আর রহিল ভৈরব-ত্রিশূল।

উত্তরকূটের উৎসব চলিতে লাগিল। উত্তরকূটের অধিবাসীরা জয়-গর্ব্বে উন্মত্ত, সপ্তাহ পরেই শিবতরাইয়ে চাষের ক্ষেত শুকাইয়া আসিবে। উত্তরকূটের পুরদেবতা এতদিন পরে প্রসন্ন হইয়াছেন, তৃষ্ণার শূলে বিদ্ধ করিয়া শিবতরাইকে এইবার তিনি উত্তরকূটের পদতলে ফেলিয়া দিবেন। উত্তরকূটের বালকদলও জানে যে উত্তরকূটের অধিবাসীরাই সকলের উপর জয়ী, তাহারাও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। শিবতরাইয়ের প্রজারা রাজার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে আসিয়াছিল, উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাহাদিগকেও জোর করিয়া টুঁটি টিপিয়া বলাইতে লাগিল—"জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!" স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় উচ্চারিত জয়ধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে শুনা গেল —

বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর, শঙ্কর!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আকাশ অন্ধকার, কিন্তু রৌদ্রের মদ খাইয়া যন্ত্রের চূড়াটা তখনও লাল হইয়া জ্বলিতেছে, আর অস্তসূর্য্যের আলো স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূল।

এমন সময় বন্দীশালায় আগুন লাগিল। এই সুযোগে খুড়ামহারাজ বিশ্বজিৎ যুবরাজকে বন্দীশালা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন—"তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।" অভিজিৎ জানেন যে এবার